পুলিশ কাহিনী

সনতোষ বড়ুয়া

একজন প্রাক্তন পুলিশ কর্মকর্তার অভিজ্ঞতায় সড়ক দুর্ঘটনা, তল্লাশীতে পুলিশের ভূমিকা।

সড়ক দুর্ঘটনা ও পুলিশী ভাবনা

সারদা পুলিশ একাডেমীতে এক বৎসরের প্রশিক্ষণ শেষে শিক্ষা নবীন এস আই হিসেবে আমি প্রথম যোগদান করি মৌলভী বাজার জেলায়। আইন কানুন সহ নানা জাতের প্রশিক্ষণ একাডেমীতে সম্পন্ন করে এলেও এ বিষয়ে বাস্তব কোন ধারনা তখনও ছিল না। তো চাকরিতে যোগদানের কয়েকদিনের মধ্যেই সড়ক দুর্ঘটনা নিয়ে এক বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ হল। সরকার বাজারের কাছে স্কুলের নাম সম্ভবত আজমনি হাই স্কুল। সেই স্কুলের একজন ছাত্র রাস্তা পার হবার সময় বাসের ধাক্কায় আহত কি নিহত হওয়ায় স্কুলের ছাত্ররা ঢাকা সিলেট সড়ক অবরোধ করে রাখে। সেই অবরোধ সরানোর জন্য এস আই ইসহাক মিয়াকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক পুলিশ সহ ঘটনাস্থলে প্রেরন করা হয়, সাথে এ বিষয়ে বাস্তব ধারনা নেয়ার জন্য আমিও সাথে যাই।

আমরা সেখানে পৌঁছার সাথে সাথেই এস আই ইসহাক মিয়ে পুলিশের ভ্যান থেকে নেমে ছাত্রদের দেয়া ইট পাথরের ব্যারিকেড পা দিয়ে সরাতে থাকেন। তাঁর সাথে অন্যান্য পুলিশ সদস্যরাও যোগ দেয়। ব্যারিকেড সরানো আগে অফিসার বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের সাথে কোন প্রকার কথাই বলেননি। এতে ছাত্ররা ক্ষেপে যায় এবং পুলিশের উপর ইট পাটকেল নিক্ষেপ করতে থাকে। এমতাবস্তায় আমারা স্কুলে প্রধান শিক্ষকের কক্ষে আশ্রয় নেই। এরপর এ এস পি (সদর) আরও পুলিশ সদস্য সহ ঘটনাস্থলে এসে ছাত্রদের সাথে আলাপ আলোচনা করে ব্যারিকেড প্রত্যাহার হলে আমারা সহ থানায় ফিরে আসি।

সন্ধ্যায় এ এস পি সাহেব আমাদের ব্রিফ করছিলেন যে, ভুল আমাদেরই হয়েছে। কারণ ঘটনাস্থলে পৌঁছার পর প্রথম পুলিশ দলের অফিসারের দায়িত্ব ছিল ছাত্রদের সাথে ঘটনার বিষয়ে আলাপ করে, উপযুক্ত বিচারের আশ্বাস দিয়ে ছাত্রদের শান্ত করে তাদের মাধ্যমে ব্যারিকেড প্রত্যাহার করা। কিন্তু পুলিশ অফিসার সেটা না করে, ছাত্রদের মনের অবস্থা বিবেচনা না করে জোর পূর্বক ব্যারিকেড সরানোর চেষ্টা করাতেই ছাত্ররা ক্ষেপেছে পুলিশের বিরুদ্ধে।

বুঝতে পেরেছিলাম কোন স্কুল কলেজের সামনে যদি কোন সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে, বা কোন গ্রামের মধ্য দিয়ে যাওয়া রাস্তায় কোন দুর্ঘটনা ঘটে তাহলে পুলিশের উচিৎ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ক্ষতিগ্রস্থ পক্ষের মানসিক অবস্থা বিবেচনায় এনে ব্যবস্থা নেয়া। দ্রুত ত্রুটি বিহীন ভাবে আইনী ব্যাবস্থা সম্পন্ন করে, ক্ষতিগ্রস্থ পক্ষের মানসিক অবস্থা বিবেচনায় এনে কার্যকরী ব্যবস্থা নেয়া। সে সময় পুলিশী কার্যক্রমে গাফেলতি দেখলে সাধারণ মানুষ অবশ্যই পুলিশের উপর ক্ষেপে যেতে পারে।

দ্বিতীয় ঘটনা :

অপর যে সড়ক দুর্ঘটনা এখনো মনে দাগ কেটে আছে সেটা হল শ্রীমঙ্গল- কমলগঞ্জ সড়কে। ১৯৯২ সালে তখন আমি কমলগঞ্জ থানায় সেকেন্ড অফিসার। দুপুর বারটা কি একটার দিকে একটি মিনি ট্রাক শ্রীমঙ্গল থেকে কমলগঞ্জ আসার পথে লাউয়া ছড়া রিজার্ভ ফরেস্টের কাছকাছি কমলগঞ্জ এলাকায় উল্টে গিয়ে রাস্তার পাশে ছড়ায় পানিতে পড়ে যায়। সেই ট্রাকে মালামালের উপরে কয়েকজন যাত্রী ছিল। তাদের মধ্যে চারজনই ট্রাকের চাপায় পড়ে ঘটনাস্থলে মারা যায়। আমি যখন ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদের সুরতহাল রিপোর্ট তৈরি করতে থাকি মৃতদেহগুলো তখনও শক্ত হয়নি। মনে হচ্ছিল ঘুমন্ত কোন মানুষ আমাদের নাড়াচাড়াতেও জাগতে পারছে না কোন না কোন কারনে। কোন মৃতদেহের শরীরে তেমন কোন আঘাতের চিহ্ন ছিল না, কারণ ট্রাকের চাপায় ছড়ার পানির নীচেই তাদের মৃত্যু হয়। দুর্ঘটনাটি ঘটেছিল মূলত নতুন তৈরি সরু পাকা রাস্তায় অধিক পরিমাণ মালামাল লোড নিয়ে বাঁক ঘোরার কারনে। যদি ট্রাকের মালামালের উপর কোন যাত্রী না থাকত তাহলে কোন প্রানহানীই ঘটত না। বাংলাদেশের মোটরযান আইনেই বলা আছে পণ্যবাহী ট্রাকে যাত্রী পরিবহন করা যাবে না। কিন্তু যাত্রী পরিবহন করে ট্রাকের চালক অন্যায় করেছে। তাছাড়া ট্রাকে অধিক পরিমাণ পণ্য বোঝাই থাকায় মোড় ঘোরার সময় ট্রাক উল্টে খাদে পড়ে যায়।

তৃতীয় ঘটনা :

আরও একটি সড়ক দুর্ঘটনা এতদিন পরেও ভুলতে পারিনি। ১৯৯৭ কি ৯৮ সাল। তখন আমি বান্দরবানের লামা থানায় কর্মরত ছিলাম। কোন এক দুপুর বেলা খেতে বসেছি। তখন সংবাদ পেলাম থানার সামনের রাস্তায় বাস দুর্ঘটনায় একজন লোক গুরুতর আহত হয়েছে। তাড়াতাড়ি ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখি আহত ব্যক্তি রাস্তার পাশে পড়ে আছে। আঘত গুরুতর। তাঁকে হাসপাতালে পাঠিয়ে বাসটি জব্দ করা হয়। চালক পালিয়ে গেছে ঘটনার সাথে সাথেই। ঘটনা ঘটেছিল এরকম- লামা থেকে যে মিনিবাস চকরিয়া যাচ্ছিল সে বাসের ছাদে করে গাছের বলী নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। আহত লোকটি সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছিল। বাসটি যখন তাঁকে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছিল তখন বাসের ছাদে থাকা একটি গাছের বলী সাইকেল যাত্রীর মাথায় পড়ে, ফলে সে গুরুতর আহত হয়। এই দুর্ঘটনার জন্যও বাসের চালক দায়ী,কারণ বাসের ছাদে অর্থাৎ যাত্রীবাহী পরিবহনের ছাদে মালামাল পরিবহন নিষিদ্ধ হলেও বাস চালক বলীর মত বিপদজনক মালামাল পরিবহন করছিল।

কিন্তু সেই সেই দুর্ঘটনায় যে বিষয়টি আমার মনে পীড়া দেয় এবং এখনো মনে বিঁধে আছে সেটা হল সেই আহত ব্যক্তি ঘটনার সাথে সাথে মারা না যাওয়ায়। মারা গেলে তিনি বেঁচেই যেতেন। কিন্তু শারিরিকভাবে পঙ্গু হয়ে বেঁচে থাকা পুরো পরিবারের জন্যই ছিল কষ্টকর। একজন চালকের অসতর্কতার কারনে একটি পরিবারকে পথে বসে যেতে দেখেছি আমি। গাড়ির মালিক হাসপাতালে চিকিৎসার সময় এক আধটু খবরাখবর নিলেও পরে আর কোন খোঁজ রাখেনি।

চতুর্থ ঘটনা :

২০০৯ সালে আমি তখন ফেনী জেলার দাগনভূঞা থানায় কমব্রত। একদিন সন্ধ্যায় একটি মোটর সাইকেলে তিনজন যুবক ফেনী থেকে দাগন ভূঞার দিকে আসছিল। মোটর সাইকেল চালক একটা বাসকে সাইড দিতে গিয়ে নিয়ন্ত্রন হারিয়ে রাস্তার পাশে বড় রেইন ট্রি গাছের সাথে ধাক্কা খায়। তিনজনই মারা গিয়েছিল মাথায় আঘাত জনিত

কারনে। যদি তাদের মাথায় হেলমেট থাকত তাহলে মনে হয় তারা আহত হলেও মারা যেত না।

এধরনের অনেক সড়ক দুর্ঘটনার কেস হিস্ট্রি মনে আছে, কিন্তু সব উল্লেখ করার প্রয়োজন নাই। যেসব দুর্বল ব্যবস্থার কারনে বাংলাদেশে সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে তার কারণ হল-

১। দ্রুত ও বেপরোয়া গতিতে গাড়ি চালানো
২। ট্রাকে বাসে অতিরিক্ত মালামাল ও যাত্রী বোঝাই করা।
৩। ত্রুটিযুক্ত গাড়ি চালানো
৪। লাইসেন্স বিহীন অদক্ষ চালকের গাড়ি চালনা
৫। সড়কের জন্য নির্ধারিত গতিসীমা না মানা
৬। সড়ক নির্মাণের ত্রুটি যা কখনই স্বীকার কারা হয় না।

এখানে উল্লেখিত ৬ নং কারণ ব্যাতিত অন্য সকল অপরাধ পুলিশ দমন করতে পারে। কিন্তু সড়কের ত্রুটি ঠিক করা পুলিশের কাজ নয়। উন্নত বিশ্বে সড়কের ত্রুটির কারনে যদি কোন স্থানে বারবার দুর্ঘটনা ঘটে, তাহলে সড়কের সেই স্থান নতুন প্যাটার্নে তৈরি করা হয়। কিন্তু বাংলাদেশে এ বিষয়ে তেমন কোন ব্যবস্থা নেয়া হয় না।

এবার পুলিশের ব্যবস্থা নেয়ার বিষয়ে আসি। কেন ট্রাফিক পুলিশ কঠোরভাবে ব্যাবস্থা নিতে পারে না? নিতে পারে না বিবিধ কারণে- যার প্রথম কারণ হল ঘুষ বাণিজ্য। দ্রুত গতিতে গাড়ি চালনার জন্য গাড়ির স্পিড রেকর্ড করার মত ডিভাইস মনে হয় বাংলাদেশ পুলিশের নেই, যেটা বিদেশে পুলিশেরা অহরহ ব্যাহার করে থাকে। কিন্তু ২ থেকে ৫ নং অপরাধ সমূহ পুলিশ কঠোর হলেই দমন করতে পারে। কিন্তু কঠোর না হতে পারার কারণ শুধু ঘুষ বাণিজ্য নয়। কোন জেলার বা উপজেলার ট্রাফিক পুলিশ যানবাহনের বিষয়ে একটু কঠোর হলেই তারা স্থানীয় নেতা, পাতি নেতার রোষানলে পড়ে, স্থানীয় নেতার তদবীর না শুনলে তারা স্থানীয় এম পি বা মন্ত্রী পর্যন্ত যায়। আমি চাকরি করাকালে এম পি / মন্ত্রীর ফোনও পেয়েছি গাড়ির বিরুদ্ধে মামলা না দেয়ার জন্য। এম পি সাহেব এমনও বলেছেন– 'যানবাহন বাদ দিয়ে যেন অন্য বিষয়ে নজর দেই। এখানে উল্লেখ্য যে, ট্রাফিক পুলিশ অফিসার যানবাহন বিষয়ে মামলা ছাড়া অন্য কোন মামালা করতে পারে না, কিন্তু থানার পুলিশ যানবাহন সহ সকল ধরনের মামলাই করতে পারে।

দীর্ঘদিন পুলিশে মাঠ পর্যায়ে চাকরি করে আমার যা' প্রতীয়মান হয়েছে তা হল– বাংলাদেশে সড়ক দুর্ঘটনা কমিয়ে আনা তেমন কোন কঠিন কাজ নয়, প্রয়োজন শুধু গাড়ির চালক, ট্রাফিক পুলিশ আর সড়ক নির্মাণ বিভাগের সচেতনতা।

এই সচেতনতায় যেন মন্ত্রী / এম পিদের হস্তক্ষেপ না থাকে। আমাদের দেশের মন্ত্রী/ এম পি রা দেশের সব বিষয়ে নাক গলাতে পটু। এ বিষয়ে একটু কম পটু হলেই হয়ে যায়। আর এই সচেতন ও আন্তরিক হবার জন্য প্রয়োজন একটু ত্যাগ। ত্যাগ হল– ট্রাফিক পুলিশকে ঘুষ বা মাসোয়ারা আদায় একটু কমাতে হবে, এ বিষয়ে ট্রাফিক পুলিশের উপরের সারির অফিসার যারা ট্রাফিক পুলিশের পোস্টিং করে থাকেন তারা মাসোয়ারার পরিমাণ একটু কমাবেন, চালক মালিক পক্ষ রাজনীতির দাপট দেখানোর চেষ্টা না করে একটু আইন কানুন মানার চেষ্টা করবেন, আর সড়ক তৈরির সময় সড়ক বিভাগের প্রকৌশলীরা চেষ্টা করবেন সড়কে যাতে এমন কোন ত্রুটি না থাকে যা দুর্ঘটনা ঘটাতে পারে।

কিন্তু এসবের কিছুই সহজে সম্ভব বলে মনে হয় না। কারণ একটাই। আমারা একে অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপাতে অভ্যস্ত, কিন্তু নিজের দোষ দেখি না। পুলিশ নিজের দোষ দেখে না, নেতারা তাদের দোষ দেখে না, গাড়ির চালক মালিক নিজেদের দোষ দেখে না, সড়ক বিভাগ নিজেদের দোষ দেখে না। দেশে একটা কিছু ঘটে গেলে ক'দিন শোরগোল চলে, এই কর, সেই কর মতামত চলে, কিন্তু ক'দিন পরই যেই লাউ সেই কদু। কারণ কি? কারণ একটাই , আমরা নীতির কথা বলি, নীতি মানি না। অন্যকে আইন নীতি মানাতে চেষ্টা করি কিন্তু নিজে মানি না।

তল্লাসী ও হয়রানী–

পুলিশের তল্লাশী অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু সেই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জনগণের অভিযোগের অন্ত নেই। কেন এই অভিযোগ? তাহলে কি ধরে নিতে পারি যে, বাংলাদেশে পুলিশের তল্লাশীতে এমন সব শারীরিক ও মানসিক উপাদান আছে যাতে মানুষ বিরক্তি অনুভব করে। আমি দীর্ঘদিন পুলিশের মাঠ পর্যায়ে চাকরি করেছি, নানা প্রকার তল্লাশীতে যুক্ত ছিলাম, সেই আলোকেই আজ কিছুটা আলোচনা করব।

তল্লাশী কেন করা হয়? নিশ্চয় নানা কারণ আছে। তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য কারণ হল–

১। মামলার আলামত জব্দ
২। ডাকাতি বা চোরাই মালামাল উদ্ধার
৩। মাদক দ্রব্য উদ্ধার
৫। বেআইনীভাবে আটক ভিকটিম উদ্ধার

এ ছাড়াও মাঝে মধ্যে সড়কে যানবাহন থামিয়ে তল্লাশী করা হয় জরুরী কোন না কোন কারণে।

মামলার আলামত জব্দ করা হয় মামলার ঘটনাস্থল থেকে, সেখানে জনসাধারণ বিরক্ত হয় না। ডাকাতি বা চোরাই মালামাল উদ্ধার করা হয় সাধারণত চোর বা ডাকাতের বাড়ি থেকে, সেখানেও মানুষ বিরক্ত হয় না। মাদক দ্রব্য উদ্ধার বা বেআইনিভাবে আটক ভিকটিম উদ্ধারের তল্লাশীতেও সাধারণ মানুষ বিরক্ত হয় না, হওয়ার কথাও নয়। আসলে মানুষ বিরক্ত হয় সড়কে যানবাহন থামিয়ে তল্লাশী করার সময়। সাধারণ মানুষ আসলে বুঝতে পারে না কেন হঠাৎ করে তল্লাশী করা হয়। যানবাহন তল্লাশী আগাম জানান দিয়ে করলেও তেমন সুফল পাওয়া যায় না। তাই হঠাৎ করে একেক জায়গায় করা হয়।

এই হঠাৎ তল্লাশীর কারনে মানুষ বিরক্ত হয়, হওয়ারও কথা। গাড়ি থামিয়ে দীর্ঘক্ষণ তল্লাশী করলে অনেকের গুরুত্বপূর্ণ কাজে বিলম্ব হয়। সেটাও আমার মতে কিছুটা জনবিরক্তির কারণ হলেও মূল কারণ নয়। আমার মূল কারণ মনে হয়– তল্লাশীকালে পুলিশের আচরণ। কোন তল্লাশীকালে পুলিশের যে ধরনের মানবিক আচরণ করার কথা পুলিশ আসলে সেরকম আচরণ করে না, কারণ বাংলাদেশের পুলিশ সে ধরনের মানবিক আচরণে অভ্যস্থ নয়।

কেন নয়, সেটাও আলোচনার দাবী রাখে। অভ্যস্থ নয় একারণে যে– বাংলাদেশের পুলিশ নিজেদের জনগণের সেবক মনে করে না, নিজেদের 'বস' মনে করে। এই মনে করার পেছনের কারণও আছে। পুলিশের প্রশিক্ষণেই সেই ত্রুটি বিদ্যমান। পুলিশের চাকরিতে নির্বাচিত হবার আগে তাঁরা পুলিশের ক্ষমতা দেখে। তারপর চাকরি পেয়ে যখন ট্রেনিং এ যায় তখন মনে মনে সেই দাপট প্রতিস্থাপিত করে, সেই প্রতিস্থাপনে সর্বাত্মক সহযোগিতা করে পুলিশের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। কীভাবে? সেটাই বলছি।

পুলিশের প্রশিক্ষণকালে আইন শিক্ষার পাশাপাশি যদি সেই আইন প্রয়োগকালীন পুলিশের আচরণ সম্পর্কে শিক্ষা দেয়া না হয়, তাহলে বিপদ তো ঘোরতর হতেই পারে। তবে একথাও ঠিক যে, কোন

আইন কীভাবে প্রয়োগ করতে হবে সেই বিষয়ে ফৌজদারি ও পুলিশ রেগুলেশনে কিছুটা উল্লেখ থাকলেও সে সব নিয়ম-কানুন পড়েই বা কে? আর পড়ে না বলেই ঘটে বিপত্তী।

যেমন কোন পুলিশ সদস্যকে যদি তল্লাশীর নিয়ম-কানুন জিজ্ঞাসা করা হয়, তাহলে শতকরা নব্বই ভাগ পুলিশ সদস্যই বলতে পারবে না সেসব নিয়মাবলী। সেই বলতে না পারাও এক সমস্যা। যেমন– কোন পুলিশ দল রাস্তায় কোন যানবাহন থামিয়ে সেই গাড়িতে উঠে সেই গাড়ির যাত্রীদের সাথে কোন প্রকার কথাবার্তা বা সৌজন্য বিনিময় না করে যখন তল্লাশী শুরু করে তখন যাত্রীরা বিরক্ত হতেই পারে। পুলিশ দল যখন গাড়িতে তল্লাশী করার জন্য ওঠেন, তখন সেই পুলিশ দলের নেতৃত্বে থাকা অফিসারের উচিৎ কর্তব্য হল তল্লাশীর শুরুতেই পাবলিক যানবাহন হলে সেই গাড়ির সকল যাত্রীদের উদ্দেশ্যে সৌজন্যমূলক ভাবে তল্লাশীর কারণ বোঝানো এবং তারপর তল্লাশী শুরু করা। তল্লাশী শেষ হলে পুনরায় সকল যাত্রীর সাথে সৌজন্য বিনিময় করা। প্রাইভেট গাড়ির যাত্রী হলে সেই গাড়ির যাত্রীদের সাথেও একই ধরনের আচরণ করতে হবে। কিন্তু এসবের বালাই আমাদের পুলিশের নেই। এখানে আরও একটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ। সেটা হল ফৌজদারি আইন এবং পুলিশ রেগুলেশন অনুযায়ী বা অন্যান্য মাইনর আইন মতে, তদন্তকারী অফিসারের নিচের পদ মর্যাদার কোন পুলিশ অফিসার (সাধারণত পুলিশের এস আই) তল্লাশী কাজে নিয়োজিত হবার কথা নয়। কিন্তু প্রায় সময় সেটাও মানা হয় না অফিসার কম থাকার কারনে। ফলে এ এস আই বা হাবিলদার বা কনস্টেবল দিয়ে যখন তল্লাশী করা হয় তখন তাঁরা তল্লাশী কালে ভাল ব্যাবহার করে না, ফলে জনগণ বিরক্ত হয়। এস আই পদমর্যাদার নিচের অফিসার দ্বারা তল্লাশীর আরও খারাপ দিক হল তাঁরা তল্লাশী করে প্রাপ্ত মামামালের জব্দ তালিকা করতে পারে না তাঁদের সেই ক্ষমতা নাই বলে। তাহলে কেনই বা তাঁদের দিয়ে তল্লাশী করানো হয়? একথার উত্তর দেবার লোক পুলিশে নাই।

সড়কে বা মহা সড়কে চেক পোস্ট বসিয়ে তল্লাশী করা হয় সাধারণত সন্ত্রাসী বা সন্ত্রাসী কাজে যুক্ত থাকতে পারে এমন লোকজনের চলাচল নিয়ন্ত্রণ করার জন্য। কিন্তু সেই কাজ করতে গিয়ে পুলিশকে অনেক সময় এমন লোকজনের ব্যাগ বা মালামাল তল্লাশী করতে হয় যে যারা জীবনে কোন প্রকার অপরাধে জড়িত হয় নাই। তখন তাঁরা বিব্রত বোধ করে এবং কিছুটা উত্তেজিতও হয়। সেকারণে তল্লাশীকারী অফিসারের সাথে অনেক সময় বচসাও হয়। এই বচসা না হওয়ার চেষ্টা করতে হবে পুলিশকেই। পাবলিক উত্তেজিত হলেই পুলিশকে কোনভাবেই উত্তেজিত হওয়া চলবে না। কিন্তু আমাদের পুলিশ সেই ধাচে তৈরি নয়। আগেই বলেছি– আমাদের পুলিশের গলদ প্রশিক্ষণেই। কারণ সেখানে জনগণের সেবক তৈরি করা হয় না, পুলিশকে তৈরি করা হয় জনগণের 'বস' হিসেবে।

তল্লাশীকালে অনাবশ্যক মন্তব্য করাও পুলিশের উচিৎ নয়। সম্প্রতি একজন নারী সাংবাদিক চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা আসার পথে তাঁর বাসটি তল্লাশীতে পড়ে। সেই বাস তল্লাশী করছিল ডি বি পুলিশ। ডি বি পুলিশ সাধারণত পোশাকে থাকে না। তবে বর্তমানে তাঁরা ডি বি নামাঙ্কিত জ্যাকেট পরিধান করে। কেন জানি সেই মহিলা সাংবাদিককেই ডি বি পুলিশের সন্দেহ হল। তাঁর হ্যান্ড ব্যাগ চেক করল। তারপর জানতে চাইল আর কোন লাগেজ আছে কিনা। সেগুলোও তাঁরা চেক করবে। তল্লাশীকারী অফিসার নাকি বারবার নারী সাংবাদিকের কপালে দেয়া বড় সাইজের লাল টিপের দিকে তাকাচ্ছিল এবং একসময় নারী সাংবাদিককে অকারণেই বলল- দেখুন আবার যেন 'গণজাগরণ মঞ্চ' এর ঘটনা না ঘটে। সেই নারী সাংবাদিক তাঁর ফেসবুক স্ট্যাটাসে লিখেছেন তাঁর ব্যাগ তল্লাশী করেছ ভাল কথা, সেই সে সময় অনাবশ্যক গণজাগরণ মঞ্চের কথা আসল কেন? এই যে এখানে তল্লাশীকারী অফিসার বিনা কারণেই বেফাঁস কথা বললেন সেটাও কিন্তু জনবিরক্তির কারণ।

আমার বাস্তব অভিজ্ঞতায় মনে হয়, পুলিশের তল্লাশীকালে পুলিশের আচরণই জনগণের বিরক্তির মূল কারণ। এই তল্লাশীকালে পুলিশ যদি তাঁর আচরণ না বদলায় অর্থাৎ জনগণের সাথে সৌজন্যমূলক আচরণ না করে তাহলে তল্লাশীতে সুফল তো আসবেই না, বরঞ্চ জনগণ পুলিশের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে। এখন যে, জনগণ পুলিশের দিকে মুখ করে রেখেছে তা নয়। তারপরও পুলিশ যদি জনগণকে নিজেদের কাছে পেতে চায়, তাহলে পুলিশকেই তাঁর জন্য অগ্রনী ভূমিকা পালন করতে হবে, কারণ বন্ধু হবার দায় পুলিশের, জনগণের নয়। কারণ পুলিশ যখন কোন কাজ প্রকাশ্য স্থানে করে তখন ভাবতে হবে সে বা তাঁরা তখন পুরো পুলিশ বাহিনীকেই তাঁদের কাজে শো করছে। ভাল করতে পারলে পুরো বাহিনীর সুনাম, আর মন্দ করলে পুরো বাহিনীর দুর্নাম। সুতারাং সুনাম বা দুর্নাম কিসের ভাগী হতে চায় পুলিশ সেই ভাবনা আজ ভাবতে হবে পুলিশকেই। জনগণ পুলিশকে ভাল চোখে দেখে না সেজন্য জনগণকে দোষ না দিয়ে কেন ভাল চোখে দেখে না সেটা ভাবতে হবে এবং ভাল চোখে দেখানো শেখাতে হবে পুলিশকে। কীভাবে? আচরণ বদলীয়ে। আচরণ সৌজন্যমূলক করে।

সনতোষ বড়ুয়া : সাবেক পুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ।
ইমেইল : sbarua63@gmail.com